হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আরোগ্য কলা

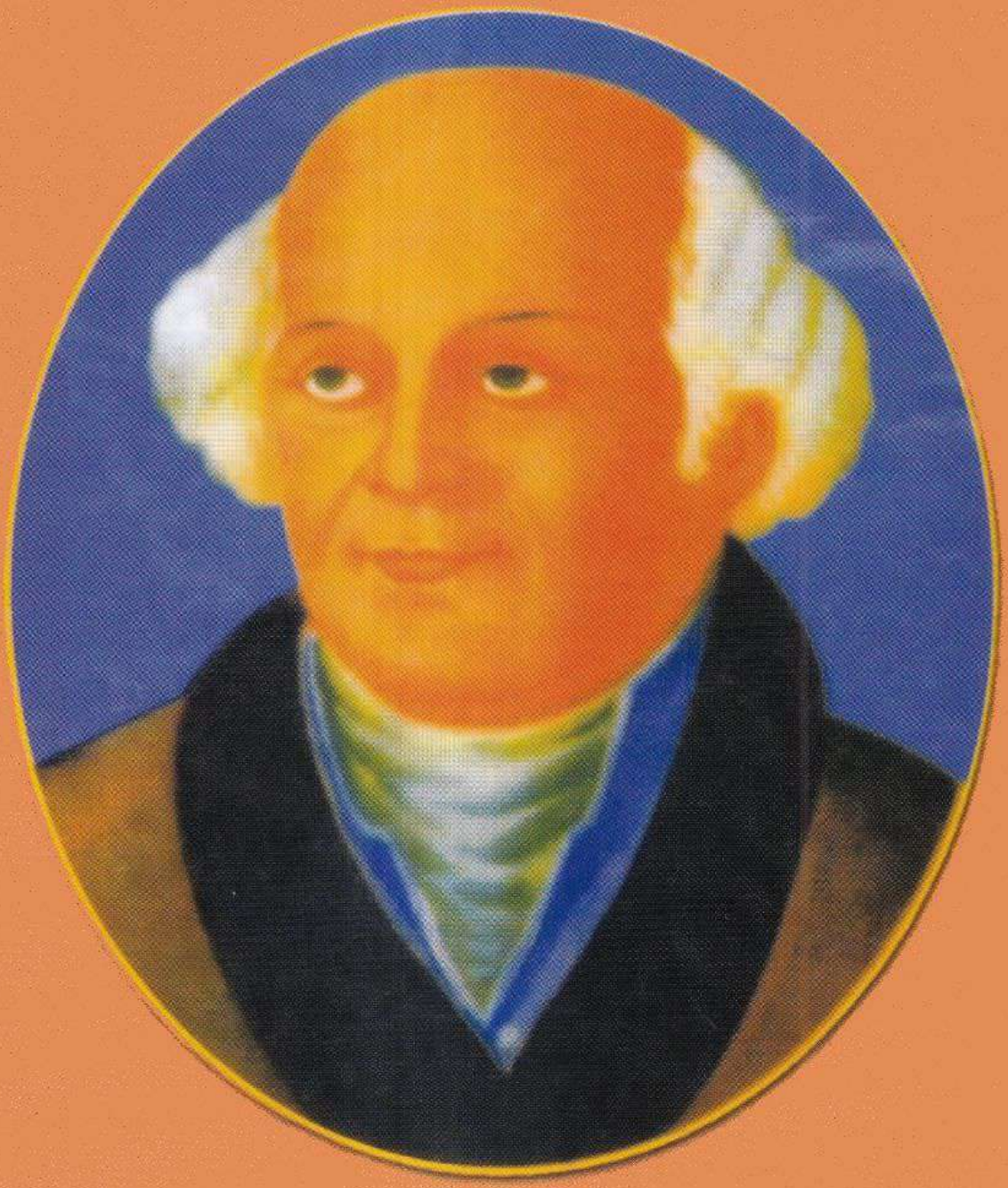

ডা. পরেশচন্দ্র সরকার

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

বিষয়			পৃষ্ঠা
	হোমিওপ্যাথিক তত্ত্ব	...	১—১০২
প্রথম অধ্যায়	হোমিওপ্যাথি-প্রবর্তনের ইতিহাস	...	৩—১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক দর্শনের মূলকথা	...	১২—১৮
তৃতীয় অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রাকৃতিক বিধান	...	১৯—২৬
চতুর্থ অধ্যায়	হোমিওপ্যাথির মূলনীতিসমূহ	...	২৭—৩১
পঞ্চম অধ্যায়	আরোগ্য	...	৩২—৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	প্রবণতা	...	৪০—৫১
সপ্তম অধ্যায়	বিশেষ প্রবণতাযুক্ত ধাতু	...	৫২—৫৬
অষ্টম অধ্যায়	চিকিৎসকের অবশ্য জ্ঞাতব্যবিষয়	...	৫৭—৬১
নবম অধ্যায়	হোমিওপ্যাথির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	...	৬২—৬৮
দশম অধ্যায়	প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসাপ্রথার সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পার্থক্য	...	৬৯—৮১
একাদশ অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক নীতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা	...	৮২—৯৪
দ্বাদশ অধ্যায়	হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্র	...	৯৫—১০২

দ্বিতীয় খণ্ড

	রোগের শ্রেণীবিভাগ		১০৩—১৩৬ (ক)
প্রথম অধ্যায়	রোগের শ্রেণীবিভাগ	...	১০৫—১১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাকৃতিক রোগের বিস্তারিত শ্রেণীবিভাগ	...	১১৪—১১৭
তৃতীয় অধ্যায়	চিররোগের শ্রেণীবিভাগ	...	১১৮—১২৪
চতুর্থ অধ্যায়	বিশেষ ধরণের রোগ	...	১২৫—১৩৫

তৃতীয় খণ্ড

বিষয়		পৃষ্ঠা
	রোগলক্ষণ সংগ্রহপদ্ধতি ও ওষুধনির্বাচন প্রণালী ...	১৩৭—২০৪
প্রথম অধ্যায়	রোগলক্ষণ ...	১৩৯—১৪৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	বিভিন্ন প্রকার রোগলক্ষণের পরিচয় ...	১৪৪—১৫২
তৃতীয় অধ্যায়	রোগলক্ষণসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও মূল্যায়ন ...	১৫৩—১৬১
চতুর্থ অধ্যায়	রোগলক্ষণ সংগ্রহনীতি ...	১৬২—১৬৮
পঞ্চম অধ্যায়	বিভিন্নপ্রকার রোগের লক্ষণ সংগ্রহপ্রণালী ...	১৬৯—১৮০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ধাতুপ্রকৃতি ...	১৮১—১৮৮
সপ্তম অধ্যায়	ব্যষ্টিকরণ নীতি ...	১৮৯—১৯৪
অষ্টম অধ্যায়	লক্ষণসমষ্টি নির্ধারণ ও ওষুধ নির্বাচন ...	১৯৫—২০০
নবম অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আরোগ্য-কলা ...	২০১—২০৪
	ওষুধ নির্বাচন পদ্ধতি	২০০—ঙ
	ভেষজের পরিচয় ও শক্তিকরণ প্রণালী ...	২০৫—২৩৮
প্রথম অধ্যায়	ভেষজপরিচয় ...	২০৬—২১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভেষজপরীক্ষার নিয়মাবলী ...	২১২—২২১
তৃতীয় অধ্যায়	হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্রিয়াধারা ...	২২২—২২৯
চতুর্থ অধ্যায়	ভেষজের শক্তিকরণ ...	২৩০—২৩৮

পঞ্চম খণ্ড

	বিভিন্ন প্রকার রোগের চিকিৎসা প্রণালী ...	২৩৯—২৮০
প্রথম অধ্যায়	অচিরপ্রকৃতির পীড়াসমূহের চিকিৎসা ...	২৪০—২৪৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	অচির পীড়ার বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ ...	২৪৬—২৫১
তৃতীয় অধ্যায়	চিররোগের চিকিৎসাব্যবস্থা ...	২৫২—২৫৮
চতুর্থ অধ্যায়	মানসিক রোগ ও তার চিকিৎসাব্যবস্থা ...	২৫৯—২৭২
পঞ্চম অধ্যায়	বিরামশীল ব্যাধির চিকিৎসাব্যবস্থা ...	২৭৩—২৮০

ষষ্ঠ খণ্ড

বিষয়			পৃষ্ঠা
	ওষুধ প্রয়োগকলা	...	২৮১—৩৮০
প্রথম অধ্যায়	ওষুধের শক্তিনিরূপণ	...	২৮৩—২৯৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	মাত্রানীতি	...	২৯৫—৩০১
তৃতীয় অধ্যায়	ওষুধ প্রয়োগরীতি	...	৩০২—৩০৯
চতুর্থ অধ্যায়	ওষুধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ	...	৩১০—৩২২
পঞ্চম অধ্যায়	দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র	...	৩২৩—৩৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	দ্বিতীয় সর্বোত্তম ওষুধ	...	৩৩৭—৩৪৩
সপ্তম অধ্যায়	রোগীর পথ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা	...	৩৪৪—৩৫৩
অষ্টম অধ্যায়	ওষুধপ্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা	...	৩৫৪—৩৬৪
নবম অধ্যায়	আরোগ্যের পথে প্রতিবন্ধকসমূহ	...	৩৬৫—৩৭২
দশম অধ্যায়	উপশম প্রদানের নীতি	...	৩৭৩—৩৮০

সপ্তম খণ্ড

	ক্রনিক মায়াজমের স্বরূপ	...	৩৮১—৪২৬
প্রথম অধ্যায়	সোরা	...	৩৮৩—৩৯৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	সিফিলিস	...	৩৯৭—৪০৩
তৃতীয় অধ্যায়	সাইকোসিস	...	৪০৪—৪১০
চতুর্থ অধ্যায়	ক্রনিক মায়াজমত্রয়	...	৪১১—৪২০
পঞ্চম অধ্যায়	একাধিক মায়াজমের সম্মিলিত অবস্থা ও তার প্রতিকারের উপায়	...	৪২১—৪২৬

পরিশিষ্ট

	হ্যানিম্যানের জীবনালেখ্য	...	৪২৯—৪৩৭

প্রথম অধ্যায়

আরোগ্যবিজ্ঞানের ইতিহাস মানবজন্মের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন। আয়ুর্বেদ, অ্যালোপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসা-পদ্ধতির বয়স তিন সহস্রেরও অধিক এবং সেগুলি চিকিৎসাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। হোমিওপ্যাথির প্রবর্তন হয় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে, ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে। এই নবপদ্ধতির প্রবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা কি? এই আবিষ্কারের ফলে আরোগ্যবিজ্ঞানের ইতিহাসে নতুন কোন দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে কি?

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু এটাই।

হোমিওপ্যাথির প্রবর্তনের ইতিহাস

জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর যেমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক মানুষের জীবনের সঙ্গে রোগেরও তেমনি নিগূঢ় সম্পর্ক। রোগ মানুষের প্রাচীনতম সঙ্গী—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সমগ্র জীবনকে সে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে চলে এবং মানুষের জীবনে দুঃখ ও অশান্তির সৃষ্টি করে। কেমন করে এই রোগ-যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া যায়, কেমন করে মানুষের দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতা ও অপূর্ণতা দূর করে মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুখী করা যায় তা-ই হলো মানুষের প্রাচীনতম ভাবনা। আর সেই ভাবনা থেকেই উদ্ভব হলো চিকিৎসা-শাস্ত্রের। রোগের আরোগ্যবিধানের নিমিত্ত বিভিন্ন মনীষী ভিন্ন ভিন্ন পথের নির্দেশ দেন। ফলে আয়ুর্বেদ, অ্যালোপ্যাথি, ইউনানী, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তন হয়।

বিভিন্নপ্রকার চিকিৎসা প্রথার উদ্ভবের কারণ

সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা হ্যানিম্যান ব্যাধির হাত থেকে মুক্তির এক অভিনব পথের সন্ধান দিলেন। সেই পথ প্রকৃতির সঙ্গে অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধানের পথ, রোগ-লক্ষণের সহিত ঔষধ-লক্ষণের সাদৃশ্য-বিধানের পথ। সেই পথের নামই হোমিওপ্যাথি। হোমিওপ্যাথি হলো সদৃশ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা-পদ্ধতি।

হোমিওপ্যাথি কি?

আরোগ্য-বিজ্ঞানের ইতিহাসে সদৃশনীতির বিধান অতি প্রাচীন। প্রতি যুগেই এমন ইঙ্গিত সুস্পষ্ট ছিল যে সদৃশমতে চিকিৎসা দ্বারা রোগ নিরাময় করা সম্ভব। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে তদর্থকরী চিকিৎসা ও বিপরীতা চিকিৎসা, অর্থাৎ সদৃশমতে চিকিৎসা ও বিপরীত মতে চিকিৎসা—এই উভয় প্রকার চিকিৎসার সুস্পষ্ট বিধান ছিল।

সদৃশ-নীতির উৎস

খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে দার্শনিক অ্যারিস্টটল ঘোষণা করেছিলেন যে রোগের সাদৃশ্য ও ওষুধের সাদৃশ্যের পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল হলো পরস্পরের বিনাশ, অর্থাৎ ওষুধের স্বাভাবিক গুণাবলীর বিনাশ এবং রোগের নিরাময়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার আদিগুরু হিপোক্রেটিস (৪৬০ খ্রীঃ পূঃ) সদৃশমতে চিকিৎসার নীতি সমর্থন করে গেছেন। তিনি বলেছেন, যে ওষুধ যে রোগ উৎপন্ন করতে পারে সেই ওষুধ সেই রোগ আরোগ্যও করতে পারে।

ইংরেজ চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্ সিডেনহামের (Sydenham) উপদেশ হলো: হয় প্রকৃতিকে অনুসরণ করে প্রকৃতিনির্দিষ্ট পথে রোগ নিরাময় কর, নয় রোগ-শত্রুকে সরাসরি কোন ওষুধপ্রয়োগে নির্মূল করো।

সেলসাস (Celsus), প্যারাসেলসাস (Paracelsus), স্টল (Stahl), হল (Hall), স্টুয়ার্ক (Stuark) প্রভৃতি চিন্তানায়কদের বক্তব্যেও সদৃশনীতির যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু এই নীতির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে কোন বিধিবদ্ধ চিকিৎসাপদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। উপরন্তু, বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্বের আবিষ্কারসমূহকে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি অন্য সমস্ত চিকিৎসাপ্রথাকে ছাড়িয়ে বহুদূরে এগিয়ে গেল। সদৃশনীতি বিস্মৃতির গহ্বরে হারিয়ে গেল।

কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রথার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে এর কিছু বিষময় ফলও অনতিবিলম্বে দেখা যেতে লাগল। আজ যে ওষুধ অমোঘ বলে ঘোষিত হলো দু'দিন যেতে না যেতেই তা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক বলে পরিত্যক্ত হল। তাছাড়া, যে রোগের জন্য ওষুধ প্রয়োগ করা হলো তা হয়তো সেরে গেল, কিন্তু অন্য নানা রকম জটিল উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। চিকিৎসাবিদ্যা যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগলো, চিকিৎসা-শাস্ত্র ততই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে শুরু করলো।

অ্যালোপ্যাথির কুফলসমূহ

বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হলো। মানুষের দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষুদ্রতর অংশে বেশি করে নিবদ্ধ হলো। ফলে মানুষের এক-একটি অঙ্গ মানুষ থেকে প্রাধান্য পেয়ে গেল। রোগ রোগীর না হয়ে তার কোন অঙ্গের রোগ বলে আখ্যা পেল। মানুষের সামগ্রিক সত্তা ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেল। আধুনিক চিকিৎসক স্বীয় স্বাধীনচিন্তা ও বিচারক্ষমতা পরিত্যাগ করে ক্রমশ ব্যয়-বহুল যন্ত্র ও নতুন নতুন তত্ত্বের উপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। যন্ত্রণাকাতর যে রোগী চিকিৎসককে বিশ্বাস করে নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলো সেই চিকিৎসকই চিকিৎসাবৃত্তির বিশেষ সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে তারই উপর বিভিন্ন ওষুধ ও তত্ত্বের নিত্যনতুন পরীক্ষা শুরু করলেন। রুগ্ন মানুষ হয়ে দাঁড়ালো ওষুধ ও তত্ত্বপরীক্ষার গিনিপিগের মতো মাধ্যম।

ফলে অনেক বিবেকবান লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতিমান চিকিৎসক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রথার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। বিজ্ঞানাচার্য, দার্শনিক ও চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ স্যামুয়েল খ্রীস্টিয়ান ফ্রেডারিক হ্যানিম্যান ছিলেন এঁদের অন্যতম। তিনি প্রচলিত এই চিকিৎসাপ্রথার ভয়াবহ পরিণামের কথা উপলব্ধি করে সখেদে ঘোষণা করলেন, "আমি এমনসব ওষুধ প্রয়োগ করছি যেগুলি সম্পর্কে আমি খুবই কম জানি, এমন দেহে প্রয়োগ করছি যার অন্তর্নিহিত ক্রিয়াধারা সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি কিছুই জানি না। অতএব মানুষের চিকিৎসার নামে তার বৃহত্তর অনিষ্টসাধন করা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে এই চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নেই। আমি বিশ্বাস করি আমি যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করেছি সেগুলি বিনাচিকিৎসায় থাকলে বর্তমান অবস্থার থেকে ভালো থাকত।"

হ্যানিম্যানের আবির্ভাব

চিকিৎসাবৃত্তির মাধ্যমে মানবসেবার যে স্বপ্ন তিনি আশৈশব দেখে এসেছিলেন সেই বৃত্তির সাফল্যের শীর্ষস্থানে আরোহণ করে তিনি একে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলেন না। তবে কি রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের শাশ্বত কোন পথ নেই? করুণাময় ভগবানের কি এই অভিপ্রায় যে তাঁর সন্তান রোগাক্রান্ত হলে সহজ, সরল ও বোধগম্য কোন উপায়ে তার রোগ নির্ণীত হতে পারে না? কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে রোগার্ত মানুষকে কোনরকম কষ্ট না দিয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্থায়িভাবে নির্মল আরোগ্যসাধন কি সম্ভব নয়?

সেই মহাসত্যের অনুসন্ধানে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তিনি বিশ্বাস

করতেন, যথার্থ আরোগ্যকলার প্রকৃতি হলো বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতামূলক বিজ্ঞান, সেখানে কল্পনামূলক প্রজ্ঞার কোন স্থান নেই। তিনি দেশবিদেশের চিকিৎসা-বিষয়ক বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। এমনিভাবে ছয় বছর কেটে গেল। এলো ১৭৯০ সাল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ সালটি স্মরণীয়। বৃক্ষ থেকে আপেল পতন যেমন নিউটনের জীবনে এবং পিসার গীর্জায় দোদুল্যমান আলোক-বর্তিকা যেমন গ্যালিলিওর জীবনে বিস্ময়কর আবিষ্কারের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল তেমনি সাধারণ এক ঘটনা হ্যানিম্যানের জীবনে নতুন এক সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল। হ্যানিম্যান তখন উইলিয়াম কালেনের (Willium Cullen) বিখ্যাত মেটেরিয়া মেডিকা পুস্তকটির অনুবাদ করছিলেন। তিনি সেখানে লক্ষ্য করলেন যে, যে সিঙ্কোনা কম্পজ্বরের (marsh-ague) ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয় সেই ওষুধটাই বৃহৎ মাত্রায় প্রয়োগ করলে কম্পজ্বরের সৃষ্টি হয় বলে উল্লেখ করা আছে। হ্যানিম্যান তখন সবেমাত্র কম্পজ্বর থেকে ভুগে উঠেছেন। তাঁর মনে চকিতে এক নতুন সম্ভাবনার কথা উদয় হলো। মানসপটে একে একে ভিড় করে এলো আর্যাবর্তের মুনি-ঋষিগণ আর প্রতীচ্যের অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটিস, সিডেনহাম, সেলসাস, স্টল আর হল। হ্যানিম্যান নিজেকে প্রশ্ন করলেন, তবে কি সদৃশমতে চিকিৎসার দ্বারা রোগ-আরোগ্য সম্ভব ?

প্রথম আলোর সন্ধান

তিনি কম্পিতহৃদয়ে অধিক মাত্রায় সিঙ্কোনা সেবন করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিশেষ ধরণের কম্পজ্বর তাঁকে জর্জরিত করে ফেলল। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি সিঙ্কোনার সূক্ষ্মমাত্রা সেবন করে রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে জাদুমন্ত্রের মতো সমস্ত কষ্টকর উপসর্গ অন্তর্হিত হয়ে গেল। হ্যানিম্যান অভিভূত হয়ে পড়লেন। আবার পরীক্ষা করলেন। না, কোন ভুল নেই।

এরপর শুরু হলো বিভিন্ন ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ আর গবেষণা। অ্যাকোনাইট স্থূলমাত্রায় প্রয়োগ করে দেখা গেল প্রদাহযুক্ত জ্বরের সূচনা হয়, তার সঙ্গে থাকে পিপাসা, অস্থিরতা আর মৃত্যুভীতি। আবার এরূপ অবস্থায় অ্যাকোনাইট সূক্ষ্মমাত্রায় প্রয়োগ করা হলে সমস্ত উপসর্গ বিলীন হয়ে যায়। এমনিভাবে নাক্স ভমিকা, পালসেটিলা, বেলাডোনা প্রভৃতি ওষুধপরীক্ষায় একই সত্যের সন্ধান পাওয়া গেল ভেষজের রোগোৎপাদিকা

সত্য-সাধনা

শক্তিই তার আরোগ্যদায়িনী শক্তি। যে ভেষজ যে রোগ সৃষ্টি করিতে পারে, সেই ভেষজই সেই ধরণের রোগ আরোগ্য করতে পারে।

দীর্ঘ ছ' বছর ধরে সত্যের সন্ধানে এই অনলস সাধনা চললো। বিশুদ্ধ চিন্তা, সংস্কারমুক্তযুক্তি, বিরামহীন অনুসন্ধান, বিশ্বস্ত পর্যবেক্ষণ আর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষার পর হ্যানিম্যান সেই মহানসত্য সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হলেন। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে মহামতি স্যামুয়েল হ্যানিম্যান উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : রোগারোগ্যের শাশ্বত পথের সন্ধান আমি জেনেছি। যে সত্য সুদীর্ঘকাল রহস্যের তিমিরাবরণে আচ্ছন্ন ছিল আমি তা উদ্ঘাটন করেছি। সেই পথ প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতার পথ। প্রকৃতির সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করে নির্মল আরোগ্য-বিধান সম্ভব নয়। আদর্শ আরোগ্যবিধানের নিমিত্ত প্রকৃতিনির্দিষ্ট একটিমাত্র পথ আছে। তা হলো similia similibus curantur—সমঃ সমং শময়তি। অর্থাৎ যে ভেষজ সুস্থদেহে যে ধরণের রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম সেই ধরণের রোগ সেই ভেষজই আরোগ্য করতে সক্ষম। মৃদু, দ্রুত ও স্থায়িভাবে আরোগ্যপ্রদানের জন্য রোগের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এমন একটি ওষুধ নির্বাচন করতে হবে যা যে রোগ নিরাময় করতে হবে সেই রোগের সদৃশ একটি রোগ নিজেই উৎপাদন করতে পারে। নির্মল আরোগ্যবিধানের এই হলো একমাত্র পথ, অন্য কোন পথ নেই।

নব আরোগ্যনীতি বা হোমিওপ্যাথি

হ্যানিম্যান এই নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির নামকরণ করলেন হোমিওপ্যাথি। গ্রীকভাষায় হোমিও মানে সদৃশ, like, similar ; আর pathos মানে উপায়, পদ্ধতি বা কষ্টভোগ—means, method or suffering. Similia similibus curantur-এর বাক্যগত অর্থ let like be cured by like অর্থাৎ সদৃশরোগসৃজনক্ষম ওষুধ দিয়েই রোগ আরোগ্য সম্ভব। হোমিওপ্যাথি এমন এক চিকিৎসা প্রথা যার মূলকথা হলো, রুগ্নমানুষের রোগ আরোগ্য করতে হলে এমন একটি ওষুধের প্রয়োগ করতে হবে যা সুস্থ মানবদেহে একই ধরণের রোগসৃষ্টি করতে সক্ষম।

হোমিওপ্যাথির অর্থ

হ্যানিম্যান এই নবচিকিৎসাপদ্ধতির প্রবর্তনই শুধু করলেন না, তিনি ইহাকে বিজ্ঞানের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে ব্যবহারিক জীবনে ইহার সঠিক প্রয়োগ-পদ্ধতিও নির্দেশ করে গেছেন। তিনি তাঁর অমরগ্রন্থ অর্গানন অফ মেডিসিনে হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্ব, রোগের স্বরূপ.

অর্গানন অফ মেডিসিন

ওষুধ-নির্বাচন ও প্রয়োগপদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থখানি তৎকালীন দিনের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সূত্র বা অনুচ্ছেদ আকারে (aphoristic style-এ) লিখিত হয়।*

অর্গানন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, কোন বৈজ্ঞানিক-বিষয়ে অনুশীলনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনার নিমিত্ত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রীঃ পূঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ অর্গাননে বৈজ্ঞানিক বিচার বিবেচনার জন্য যুক্তিসম্মত প্রয়োজনীয় বিধানাবলী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। লর্ড বেকন (১৫৬১ খ্রীঃ) যিনি আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয়ে প্রকৃতি থেকে সরাসরি শিক্ষাগ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর Novum Organon নামক গ্রন্থে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য আরোহ-পদ্ধতি (induction method of logic) অনুসরণ করবার এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। এটা তাই বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ যে হ্যানিম্যান তাঁর প্রবর্তিত নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির বিধানাবলী সম্বলিত পুস্তকের নামকরণ করেছেন অর্গানন অফ মেডিসিন। প্রকৃতপক্ষে আরোহনীতি অনুসরণ করেই হোমিওপ্যাথির মূলনীতিগুলির সূত্র পাওয়া যায়।

অর্গাননে মোট ২৯১টি সূত্র বা অনুচ্ছেদ (aphorisms) রয়েছে, একে প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) তত্ত্বগত অংশ (doctrinal part)—১ থেকে ৭০ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।

(২) ব্যবহারিক অংশ (practical part)—৭১ থেকে ২৯১ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।

তত্ত্বগত অংশে রয়েছে—

(ক) চিকিৎসকের লক্ষ্য (mission) ঃ (১-৪ অনুচ্ছেদ)

(খ) রোগসম্বন্ধে জ্ঞান ঃ (৫-১৮ অনুচ্ছেদ)

(গ) ওষুধসম্বন্ধে জ্ঞান ঃ (১৯-২৭ অনুচ্ছেদ)

(ঘ) ওষুধনির্বাচন ও প্রয়োগপদ্ধতি ঃ (২৮-৬৯ অনুচ্ছেদ)

(ঙ) সারাংশ ঃ (৭০ অনুচ্ছেদ)

ব্যবহারিক অংশে রয়েছে—

(ক) রোগ নিরাময় করতে হলে কি কি জানতে হবে ঃ (৭১-১০৪ অনুচ্ছেদ)

(খ) ভেষজের গুণাগুণ পরীক্ষা ঃ (১০৫-১৪৫ অনুচ্ছেদ)

---

* এই বইতে যেখানে অনুচ্ছেদের উল্লেখ আছে সেখানে হ্যানিম্যান রচিত অর্গাননের অনুচ্ছেদ বুঝতে হবে।

(গ) ওষুধপ্রয়োগপদ্ধতি : (১৪৬-২৮৫ অনুচ্ছেদ)

(ঘ) ওষুধ ব্যতীত অন্যান্য শক্তির যেমন তড়িৎশক্তি, চুম্বকশক্তি, মেস-মেরিজম, স্নান ইত্যাদির ব্যবহার : (২৮৬-২৯১ অনুচ্ছেদ)*

মোট কথা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রথার যাবতীয় বিষয় হ্যানিম্যান তাঁর অর্গানন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্গাননকে হোমিওপ্যাথদের বাইবেল বলা হয়। শুধু হোমিওপ্যাথিতে নয়, এই বইখানিকে চিকিৎসা-দর্শনের এক শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে অভিহিত করা হয়।

এছাড়া হ্যানিম্যান তাঁর মেটেরিয়া মেডিকা পিউরা (Materia Medica Pura) গ্রন্থে বিভিন্ন ওষুধের লক্ষণরাজি সুপরিকল্পিতভাবে এবং বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে হ্যানিম্যানের অন্যতম অবদান হলো চিররোগের প্রকৃতি ও তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে নতুন আলোকসম্পাত করা। মানবজাতির ইতিহাসের প্রথমযুগ থেকে যে সংখ্যাতীত দুরারোগ্য ব্যাধি মানবসমাজকে জর্জরিত করে রেখেছে সেইসব ব্যাধির কবল থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে তিনি সেইসব চিররোগের প্রকৃতি ও তার যথাযথ চিকিৎসার বিধান তাঁর ক্রনিক ডিজিজেস (The Chronic Diseases) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এইসমস্ত নির্দেশে কোনপ্রকার অনুমান বা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়নি। এসবই হ্যানিম্যানের দীর্ঘজীবনের নিরলস সাধনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল।

ক্রনিক ডিজিসেস

হ্যানিম্যান নিজেকে কখনও হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্তা বলে দাবী করেননি। সদৃশনীতি অনুযায়ী চিকিৎসাপ্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্নদেশে বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোন দেশেই এই নীতির উপর ভিত্তি করে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসাপদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। এপ্রসঙ্গে হ্যানিম্যান বলেছেন, "হাজার হাজার বছর ধরে সেই সত্য অজ্ঞাত থাকলেও প্রত্যেক যুগেই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। কারণ, সর্বজ্ঞ করুণাময় ভগবানের মতো সত্যও চিরশাশ্বত। ইহা সুদীর্ঘকাল মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতে পারে, যতদিন না বিধিনির্দিষ্ট কাল

হ্যানিম্যান কি হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্তা ?

---

* ডাঃ বি কে সরকার